মানুষের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়
Ethnic Identity of Human Being

ইউনিট ৪

নরগোষ্ঠী বলতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলো সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট মানবপ্রজাতির উপবিভাগকে বুঝায়। এক্ষেত্রে বিবেচ্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলো হলো মাথার চুল, মাথার আকৃতি, নাকের ধরন, চোখের গঠন ও চোখের মণির রঙ, মুখমন্ডলের গঠন, ঠোঁটের প্রকৃতি, গায়ের রঙ, দৈহিক উচ্চতা ইত্যাদি। এছাড়া কখনও কখনও চোখের ভ্রু, কানের প্রকৃতি, কপালের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়গুলোও বিবেচিত হয়ে থাকে।

বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নির্ণয় করা সহজ নয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে মনীষীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাঙালি জাতি মূলত একটি মিশ্র বা সংকর নৃগোষ্ঠী। মিশ্রতা সত্ত্বেও বাঙালি জাতিকে অনেকে 'অস্ট্রো-এশিয়াটিক বা অস্ট্রিক' বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলেও অভিহিত করেছেন। কেবল দৈহিক বৈশিষ্ট্যেই নয়, বাঙালি সংস্কৃতি বিনির্মাণেও অস্ট্রিক তথা আদি-অস্ট্রেলীয়দের প্রভাব সর্বাধিক। সম্প্রতি ভেলাম ভ্যান সেন্ডেল (Willem Van Schendel) তাঁর A History of Bangladesh গ্রন্থে উল্লেখ করেন, বাংলা ভাষায় টিবেটো-বার্মা, অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাব আছে। যার অর্থ হচ্ছে বাঙালি নৃগোষ্ঠীর মধ্যেও এদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

নরগোষ্ঠী (Race) এবং নৃগোষ্ঠীকে (Ethnic group/ethnic community) অনেকে সমার্থক অর্থে ব্যবহার করেন। তবে প্রত্যয় দু'টির ব্যবহার এবং ধারণার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। নরগোষ্ঠী হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বংশধারা থেকে উত্তরাধীকারসূত্রে প্রাপ্ত অভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী। আর নৃগোষ্ঠী হচ্ছে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় অভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধীকারী জনগোষ্ঠী। নরগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্য এবং নৃগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে অভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায়। তবে একই নরগোষ্ঠীর সদস্যরা প্রায়ই অভিন্ন সংস্কৃতির চর্চা করেন। আবার অভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে একই নরগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৯ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৪.১ নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ৪.২ পৃথিবীর প্রধান নরগোষ্ঠীসমূহ
পাঠ- ৪.৩ বাঙালি জাতির নৃগোষ্ঠীগত পরিচয়
পাঠ- ৪.৪ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ
পাঠ- ৪.৫ চাকমা
পাঠ- ৪.৬ মারমা
পাঠ- ৪.৭ ত্রিপুরা ও গারো
পাঠ- ৪.৮ সাঁওতাল
পাঠ- ৪.৯ মণিপুরি ও রাখাইন

পাঠ-৪.১ নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

Definition and Characteristics of Race

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা বলতে;
- নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নরগোষ্ঠী, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক এলাকা।

মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হল- 'হোমো-সেপিয়েন্স' (Homo-Sapiens)। মানুষের মধ্যে শরীরগত নানা পার্থক্য রয়েছে। শরীরগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবপ্রজাতির এক একটি উপবিভাগকে বোঝাতে নরগোষ্ঠী বা নৃগোষ্ঠী (Race) প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Race এর সমার্থক শব্দ হিসেবে Ethnic Group বা Ethnic Community প্রত্যয়টিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে বোঝাতে Race শব্দটি ব্যবহাহৃত হলেও সমাজবিজ্ঞানে প্রত্যয়টির বহুবিধ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ইংরেজ লেখকরা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বোঝাতে এ পদটি ব্যবহার করেন; যেমন- আইরিস রেস, স্কটিস রেস। কখনো কখনো ধর্মীয় দল-উপদলকে বোঝাতেও প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়, যেমন- Jewish Race।

নরগোষ্ঠীর সংজ্ঞা

নরগোষ্ঠীকে এমন একটি মানবসমষ্টি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যার সদস্যদের জন্মগতভাবে প্রাপ্ত অভিন্ন কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট থাকে যা তাদেরকে অন্যান্য মানবগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে।

সামাজিক নৃবিজ্ঞানী E. B. Tylor-এর মতে, নরগোষ্ঠী হল স্বাতন্ত্র্যসূচক এবং জন্মসূত্রে বর্তায় এমন দৈহিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সমন্বয়ে গঠিত মানবজাতির একটি প্রধান বিভাগ। সাধারণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীকেও তিনি নৃগোষ্ঠী বলে অভিহিত করেছেন (Ethnic community is a group distinguished by common cultural characteristics)।

সমাজবিজ্ঞানী John M. Shepard তাঁর Sociology গ্রন্থে বলেন, নৃগোষ্ঠী হচ্ছে জনসংখ্যার সেই এক বিশেষ অংশ যারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতগুলো দৃষ্টিগোচর দৈহিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে।

নৃবিজ্ঞানী মেয়ার (Mayer)-এর মতে, নরগোষ্ঠী হল একটি সুনির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী এমন একদল মানুষ যাদের মধ্যে সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং যারা অন্যদের থেকে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ভিন্ন।

সুতরাং নরগোষ্ঠী হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যে অধিকারী মানগোষ্ঠী, যারা বিশ্বের নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে অভিন্ন সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে বসবাস করে। একটি নরগোষ্ঠীর সদস্যগণ সাধারণত অন্য নরগোষ্ঠীর সদস্যদের থেকে সাংস্কৃতিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর হয়ে থাকে।

নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে নরগোষ্ঠীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন:

(ক) নরগোষ্ঠী হচ্ছে মানবজাতির অন্যতম প্রধান উপবিভাগ;

(খ) নরগোষ্ঠীর মূলে রয়েছে স্বতন্ত্র ও সাধারণ কিছু দৈহিক বৈশিষ্ট্য, যা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়;

(গ) সাধারণত মাথার গড়ন, মুখের চোয়াল, চুলের রং ও ধরন, গায়ের রং, নাক, চোখ, শারীরিক গঠন ও উচ্চতার মাধ্যমে নরগোষ্ঠী নির্ধারিত হয়;

(ঘ) বংশগতভাবে প্রাপ্ত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই নরগোষ্ঠীকে পৃথক করা হয়;

(ঙ) নরগোষ্ঠী মানুষের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য যা বংশ পরম্পরায় অব্যাহত থাকে;

(চ) নির্দিষ্ট নরগোষ্ঠী প্রায়শ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে;
(ছ) প্রত্যেক নরগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নরগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করে নরগোষ্ঠী। বিশ্বে প্রধানত শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়, মঙ্গোলীয় এবং অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া আছে সংকর নরগোষ্ঠী। বাঙালি মানবগোষ্ঠী সংকর নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। মানবগোষ্ঠীর পরিচয় জানতে হলে তার নরগোষ্ঠীগত পরিচয় জানা জরুরি। নরগোষ্ঠীগত পরিচয়ের সাথে মানুষের ভাষা এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পৃক্ত। এটি অনেকটা জন্মপরিচয়ের মত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Race শব্দটি কি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?
- ক) নরগোষ্ঠী
- খ) সাংস্কৃতিক মানবগোষ্ঠী
- গ) ধর্মীয় গোষ্ঠী
- ঘ) সবগুলো

২। নরগোষ্ঠীর মূল অর্থ হচ্ছে–
- ক) দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভাজন
- খ) আর্থিক সক্ষমতার ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভাজন
- গ) ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভাজন
- ঘ) ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভাজন

পাঠ-৪.২ পৃথিবীর প্রধান নরগোষ্ঠীসমূহ
Major Races of the World

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মানবজাতির প্রধান প্রধান নরগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করতে পারবেন;
- নরগোষ্ঠীগুলোর দৈহিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নরগোষ্ঠী, ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রীয়, অস্ট্রালয়েড।

পৃথিবীর সব মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্য অভিন্ন নয়। কতকগুলো দৃষ্টিগোচর দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে মানবজাতিকে কয়েকটি বৃহত্তর উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ সকল উপবিভাগের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলো সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নানা ভিন্নতা বিদ্যমান। বিভিন্ন জীববিজ্ঞানী এবং নৃবিজ্ঞানীগণ নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নরগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণিকরণ করেছেন। যেমন:

ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus, 1707-1778) মানবগোষ্ঠীর চারটি শ্রেণির কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে: ১. আমেরিকান (রেড ইন্ডিয়ান), ২. ইউরোপীয়, ৩. এশীয় এবং ৪. আফ্রিকান।

বিখ্যাত জার্মান নৃবিজ্ঞানী জোহান ফ্রেডারিক ব্লুমেনবাখ (Johan Frederich Blumenbuch, 1716- 1799) মানুষেকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: ১. ককেশীয় বা সাদা, ২. মঙ্গোলীয় বা হলুদ, ৩. মালয়ী বা বাদামি, ৪. আমেরিকান বা লাল, এবং ৫. আফ্রিকান বা কালো।
১৯০৪ সালে সি.এইচ. স্ট্রাটজ সমগ্র মানবজাতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। যথা: ১. আদিম (Primitive) এবং ২. সংকর (Metamorphic hybrid)। একই সালে ডাকওয়ার্থ (Duckworth) মাথা ও চোয়ালের বৈশিষ্ট্য এবং করোটিতত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণে মানবজাতিকে সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা: ১. অস্ট্রেলীয়; ২. আফ্রিকান; ৩. আন্দামান; ৪. ইউরোপীয়; ৫. পলিনেশীয়; ৬. গ্রীনল্যান্ডীয়; এবং ৭. দক্ষিণ আফ্রিকীয়।

১৯২৯ সালে এ. সি. হ্যাডন (A.C. Haddon) চুলের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর যে শ্রেণিকরণ করেন তা হচ্ছে: ১. উলোট্রিচি (Ulotrichi)– কুঞ্চিতকেশ, ২. সিমোট্রিচি (Cymotrichi)– তরঙ্গায়িত কেশ এবং ৩. লিওট্রিচি (Leotrichi)– মসৃণ কেশ।

১৯৬০ সালে মুখাবয়বের আকৃতি ও অভিক্ষেপের ভিত্তিতে Isidore Geoffroy Saint Hilaire মানব শাখার চারটি প্রধান শ্রেণীরূপ করেন। যথা: ১. ককেশীয়, ২. মঙ্গোলীয়, ৩. ইথিওপীয় এবং ৪. হটেনটট।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে টি. এইচ. হাক্সলি মানবজাতিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেন। বিভাগগুলো হল: ১. নিগ্রো জাতি, ২. অস্ট্রেলীয় জাতি, ৩. মঙ্গোলীয় জাতি, ৪. সানথোক্রয়েড (Xanthochroid) জাতি এবং ৫. মেলনোক্রয়েড (Malnochroid) জাতি।

ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর কয়েকটি ধরন পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হচ্ছে: ক) ইউরোপীয়, খ) আমেরিকান, গ) আফ্রিকান, ঘ) অস্ট্রেলীয় ঙ) এশীয়, চ) ইন্ডিয়ান, ঘ) মাইক্রোনেশীয়, ঙ) মেলানেশীয় এবং চ) পলিনেশীয়।

প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন কারণে রেসমিশ্রণ ঘটার কারণে নরগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ মানদন্ড খুঁজে পাওয়া কঠিন। বস্তুত নরগোষ্ঠীর সর্বসম্মত বা সর্বজনীন কোনো শ্রেণিবিভাগ নেই। উপর্যুক্ত বিভিন্ন ধরন বিশ্লেষণ করে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য যে শ্রেণিকরণটি করা হয় তা হলো:

১. ককেশীয় (Caucasoid);
২. মঙ্গোলীয় (Mongoloid) এবং
৩. নিগ্রীয়(Negroid)।

পরবর্তীতে চতুর্থ আরেকটি উপবিভাগ যুক্ত করা হয়। সেটি হলো অস্ট্রালয়েড (Australoid)। এখানে উল্লেখিত প্রধান তিনটি নরগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

১. **ককেশীয় বা শ্বেতকায় :** ককেশীয়দের মাথা প্রধানত লম্বাকৃতির হয়। এদের মুখ সরু বা লম্বাকৃতির, নাক প্রধানত খাড়া, চিকন, লম্বা ও সরু, চোখের রং হালকা থেকে কালো বাদামি, ঠোঁট পাতলা ধরনের এবং কান মাঝারি গোছের। এদের গায়ের রং প্রধানত সাদা বা লালচে সাদা। ককেশীয়দের চুলের রং বাদামি বা সোনালি এবং এরা দীর্ঘ দেহের অধিকারী।

২. **মঙ্গোলীয় বা বাদামি :** মঙ্গোলীয়দের মাথার আকৃতি প্রধানত চওড়া এবং গোল। এদের মুখাকৃতি চওড়া ও খর্বাকৃতির, নাক মোটা এবং চ্যাপটা। এদের গায়ের রং বাদামি বা হলুদ ধরনের, ঠোঁট মাঝারি ধরনের, চোখ কালো বাদামি। একমাত্র মঙ্গোলীয়দের চোখের পাতায় একটি ভাঁজ থাকে যাকে এপিক্যানথিক ফোল্ড বা নৃতাত্ত্বিক ভাঁজ বলে। মঙ্গোলীয়রা উচ্চতায় মাঝারি এবং তাদের শারীরিক গঠন খুব সুঠাম ও শক্তিশালী।

৩. **নিগ্রীয় বা কৃষ্ণকায় :** নিগ্রোদের মাথা সাধারণত লম্বাকৃতির, তবে কারো কারো মাথা চওড়া। এদের মুখাকৃতি ককেশীয়দের মতো অতটা লম্বা বা সরু নয়। এদের নাক মোটা ও মাংসল। এদের গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হয়ে থাকে। নিগ্রোদের ঠোঁট মোটা ও পুরু, চোখের রং কালো, কান ছোট ও প্রশস্ত। এদের চুলের রং কালো ও চুল কোঁকড়ানো হয়ে থাকে। নিগ্রো জনগোষ্ঠীর লোকেরা লম্বাকৃতি, মাঝারি এবং খর্বাকৃতি ধরনের হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর সব মানুষ এক ও অভিন্ন নয়। দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীকে বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। এটিই নরগোষ্ঠী। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন শ্রেণিকরণ করেছেন। ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতেও মানবগোষ্ঠীর শ্রেণিকরণ পরিলক্ষিত হয়। সর্বসম্মত বা সর্বজনীন কোনো শ্রেণিকরণ না থাকলেও নরগোষ্ঠীর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য চারটি ধরন হচ্ছে: শ্বেতকায়, কৃষ্ণকায়, মঙ্গোলীয় এবং অস্ট্রেলীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্যারোলাস লিনিয়াস নরগোষ্ঠীর কয়টি শ্রেণির উল্লেখ করেছেন?
ক) তিনটি খ) চারটি
গ) পাঁচটি ঘ) সাতটি

২। কোন নরগোষ্ঠীর গায়ের রং বাদামি বা হলুদ ধরনের?
ক) মঙ্গোলীয় খ) ককেশীয়
গ) নিগ্রীয় ঘ) অস্ট্রেলীয়

৩। চুলের বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর শ্রেণিকরণ করেছেন কে?
ক) জোহান ফ্রেডারিক ব্লুমেনবাখ খ) সি.এইচ. স্ট্রাটজ
গ) টি. এইচ. হাক্সলি ঘ) এ. সি. হ্যাডন

পাঠ-৪.৩ বাঙালি জাতির নরগোষ্ঠীগত পরিচয়
Racial Identity of Bengali Nation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাঙালি জাতির নরগোষ্ঠীগত পরিচয় বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মানুষের নরগোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাঙালি জাতি, নরগোষ্ঠীগত পরিচয়, সংকর নৃগোষ্ঠী।

বাংলাদেশে বসবাসকারী মানুষের প্রাক-ইতিহাস যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ সমর্থিত নয়। আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার অভাবে জীবাশ্মবিজ্ঞানের গবেষণা এখানে তেমন হয়নি। আর সেকারণেই বাংলাদেশের মানুষের আদি পরিচয় ও জন্ম-উৎস এখনো অনেকটা অমীমাংসিত।

এ অঞ্চলে প্রথম অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর লোকরা আসে এবং সেটি সম্ভবত পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে ইন্দোচীন থেকে। এরপর একে একে দ্রাবিড়, আর্য, মঙ্গোল, শক, সেন, বর্মণ, তুর্কি, পাঠান, ইরানি, আরবীয়, আবিসিনীয়, ইংরেজ, পর্তুগিজ, মগ, ওলন্দাজ, আলপাইন প্রভৃতি ধারার মানুষদের আগমন ঘটে। এসব নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণে বাঙ্গালীরা একটি সংকর জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। অনেকের মতে সংকর জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালীদের দেহবৈশিষ্ট্যে আদি অস্ট্রেলীয় বা অস্ট্রিক তথা ভেড্ডিড জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকট।

মানবজীবাশ্ম সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের ঘাটতি থাকার কারণে বাংলাদেশের মানুষের নৃগোষ্ঠীগত পরিচয় নির্ণয় করা সহজ নয়। সাধারণভাবে স্বীকৃত মতামত হলো, এ অঞ্চলে আদি মানুষের বসবাস ছিল না। ফলে এখানে একসময় যারা বসতি স্থাপন করেছে তারা সবাই বহিরাগত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মানুষের মিলন-বিরোধের ফলে বাংলাদেশে একটা সংকর জনগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। স্যার হার্বার্ট রিজলে (Sir Herbert Risley) ভারতীয় উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে সাতটি উপবিভাগে বিভক্ত করেন। এগুলো হচ্ছে:

১. তুর্কীয়-ইরানীয় (Turko-Iranian);
২. ভারতীয় আর্য (Indo-Aryan);
৩. শক-দ্রাবিড় (Scytho-Dravidian);
৪. আর্য-দ্রাবিড় (Aryo-Dravidian);
৫. মঙ্গোল-দ্রাবিড় (Mongolo-Dravidian);
৬. মঙ্গোলীয় (Mongoloid) এবং
৭. দ্রাবিড়ীয় (Dravidian)।

রিজলের মতে বাঙালিরা হল মঙ্গোল-দ্রাবিড়-প্রভাবিত একটা সংকর জনগোষ্ঠী। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে, বাঙালির শ্যামলা ও পীত গায়ের রং, চওড়া (গোল) মাথা, মধ্যমাকৃতি থেকে চওড়া নাক এবং মাঝারি উচ্চতা মঙ্গোলীয় প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। আবার বাদামি-কালো গায়ের রং, লম্বা মাথা, চওড়া নাক, চোখের রং ও গঠন, মুখে দাড়ি-গোঁফের আধিক্য দ্রাবিড়-প্রভাবেরই ফল।

জে. হুটন (J. Hutton) ভারতীয় উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে মোট আটটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলো হলো:

১. নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু (Negrito);
২. আদি-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid);
৩. আদি-মেডিটেরিয়ান (Early Meditarrinian);
৪. সভ্য-মেডিটেরিয়ান (Civilized Meditarrinian);
৫. আর্মানীয় (Armanoid);
৬. আলপাইন (Alpine);
৭. বৈদিক-আর্য (Vedic-Aryan) এবং
৮. মঙ্গোলীয় (Mongoloid)।

পন্ডিত বিরজাসংকর গুহ ভারত উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে ছয়টি নৃতাত্ত্বিক ধারায় ভাগ করেছেন। এগুলো হল:

১. নিগ্রোবটু (Negrito);
২. আদি অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid);
৩. মঙ্গোলীয় (Mongoloid);
৪. মেডিটেরিয়ান (Mediterrinian);
৫. আলপো-দিনারীয় (Alpo- Dinarik) এবং
৬. নর্ডিক (Nordic)।

নৃতত্ত্ববিদ ভন আইকস্টেড্ট (Von Eickstedt) ভারতীয় উপমহাদেশের মানবগোষ্ঠীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলো হল:
১. ভেড্ডিড-প্রাচিন অধিবাসী; ২. মেলানীড-কৃষ্ণকায় অধিবাসী এবং
৩. ইন্ডিড-আধুনিক অধিবাসী।

ভারতীয় পন্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন যে, বাঙালিরা বৈদিক-আর্যভাষি জাতিসমূহ দ্বারা প্রভাবিত। *বাঙালির ইতিহাস* গ্রন্থে (আদিপর্ব) নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেছেন, বাঙালির নৃগোষ্ঠী গঠনে আদি অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড় প্রভাবের পাশাপাশি আর্যপ্রভাবও রয়েছে। নৃতাত্ত্বিকেরা বাংলাদেশী মানুষের দেহে নিগ্রোবটুদের প্রভাবও লক্ষ্য করেছেন। এই প্রভাবের ফলে বাংলাদেশীদের মধ্যে খর্বাকৃতি দেহ, গায়ের রং কৃষ্ণাভ, পুরু ঠোঁট, চ্যাপ্টা নাক দৃষ্টিগোচর হয়।

বাংলাদেশের প্রাচীন মানুষের বিভিন্ন পর্যায়ে ভেড্ডিড রক্তের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সাঁওতাল, মুন্ডা, পোদ, শূদ্র, বাগদী, চন্ডাল, এমনকি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যেও এ ভেড্ডিড জাতির রক্তপ্রবাহ বহমান। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর আগমন ঘটে যারা রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিল। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় অনেক বহিরাগত রাজবংশ যেমন- সেন, বর্মণ, খড়গ ও চন্দ্র বাঙালির দৈহিক কাঠামোতে প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া তুর্কি, পাঠান, মোঘল, ইরানি, আবিসিনীয় ও আরবীয় রক্তের ধারাও বাঙালির ধমনিতে প্রবহমান। ষোড়শ শতাব্দীতে বহিরাগত ইংরেজ, পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসি, দিনেমার এবং আরাকানের মগ জলদস্যুদের প্রভাবও বাঙালির রক্তে বিদ্যমান। এসবের দীর্ঘ ও পর্যায়ক্রমিক সংমিশ্রনে বাংলাদেশে সংকর বা মিশ্র জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে।

সংকর জাতি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালির স্বকীয় দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বাঙালির লম্বা প্রকৃতির মাথা, কালো চুল, চোখের মণি বাদামি বা কালো, গায়ের রং কালো-বাদামি, মাঝারি দৈহিক উচ্চতা, মুখাকৃতি লম্বা, মধ্যমাকৃতির নাসিকা এবং মুখে দাড়ি-গোঁফের প্রাচুর্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, এ বৈশিষ্ট্য অনেকটাই অস্ট্রিক প্রভাবিত। বাঙালির সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অস্ট্রিক ভাষার প্রকট প্রভাব রয়েছে। তবে বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতিতে টিবেটো-বার্মা, অস্ট্রো-এশিয়াটিক এবং দ্রাবিড়ীয় ভাষার প্রভাবও অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভারতীয় জনগোষ্ঠীর উপর কোন কোন নরগোষ্ঠীর প্রভাব রয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কেবল ভৌগোলিক বা নৃতাত্ত্বিক কারণে নয়, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে ভারতীয় উপমাহাদেশের জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করার সুযোগ নেই। বাঙালির নরগোষ্ঠীগত পরিচয়েও তাই ভারতীয় উপমাহাদেশের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হয়। তবে সার্বিক বিচারে এ মতই প্রসিদ্ধ যে, বাঙালি সংকর জাতি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর আগমনে এরূপ জাতিগত সংমিশ্রন ঘটেছে। এ সংমিশ্রন কেবল নরগোষ্ঠীগত নয়, ভাষা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। তবে নৃতাত্ত্বিকদের মতে, সংকর এ জাতিগোষ্ঠীর উপর অস্ট্রিক প্রভাব দৃশ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জে. হুটন (J. Hutton) ভারত উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে কয়টি ভাগে ভাগ করেন?
ক) ৬ টি খ) ৭ টি
গ) ৮ টি ঘ) ৯ টি

২। স্যার হার্বার্ট রিজলে ভারত উপমহাদেশের জনসমষ্টিকে কয়টি ভাগে ভাগ করেন?
ক) ৬ টি খ) ৭ টি
গ) ৮ টি ঘ) ৯ টি

পাঠ-৪.৪ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ
Ethnic Groups in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, নৃগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চাকমা, মারমা, সাঁওতাল।

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বাস। এখানে প্রধান নৃগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি- যাদের ভাষা বাংলা এবং অধিকাংশই সমতল ভূমিতে বসবাস করে। এছাড়া বাংলাদেশে প্রায় ৫২টির মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী (Ethnic Grpoup) রয়েছে যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান বাঙালি নৃগোষ্ঠী থেকে পৃথক। কেবল বাঙালি নৃগোষ্ঠী নয়, প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থেকেও আলাদা। এ অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, রাখাইন, সাঁওতাল, কুকি, তঞ্চঙ্গ্যা, কুমি, লুসাই, পাংখো, খুমি, খিয়াং, বনযোগী, মণিপুরী, খাসিয়া, গারো, হাজং, কোচ, ডালুই, রাজবংশী, মুন্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংজ্ঞা

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী একটি স্বতন্ত্র নরবংশ বা নরগোষ্ঠী। এরা সংখ্যায় এরা ক্ষুদ্রও হতে পরে আবার বড়ও হতে পারে। নৃগোষ্ঠী বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংগঠিতভাবে বসবাস করে, যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে যা অন্য জাতিগোষ্ঠী থেকে পৃথক।

বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী E.B.Tylor তাঁর *Dictionary of Anthropology* গ্রন্থে বলেন, নৃগোষ্ঠী স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক ঐক্যই এদেরকে সংগঠিত করে রাখে (Ethnic community is a group distinguished by common cultural characteristics)।

Oxford Advanced Learner's Dictionary তে বলা হয়েছে, নৃগোষ্ঠী হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসরত জনসমষ্টি যারা নিজস্ব প্রথা, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির অনুসারী।

David Jary and Julia Jary তাঁদের *Collins Dictionary* তে বলেছেন, Ethnic group is a group of people sharing an identity which arises from a collective sense of a distinctive history. অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে মানুষের এমন একটি গোষ্ঠী যারা স্বতন্ত্র ইতিহাসের সম্মিলিত অনুভূতি থেকে উদ্ভুত পরিচয় বহন করে।

William P. Scott এর মতে, Ethnic group is a group with a common cultural tradition and sense of identity which exists as a sub group of a larger society. অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বলতে এমন এক মানবগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা নিজস্ব পরিচিতিসহ বৃহৎ কোনো সমাজের উপ-গোষ্ঠী হিসেবে বসবাস করে।

সমাজবিজ্ঞানী Robertson তাঁর *Sociology* গ্রন্থে বলেন, Those who share similar cultural traits are socially defined as ethnic group. অর্থাৎ যারা অভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে তাদেরকে সামাজিকভাবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

সুতরাং নৃগোষ্ঠী বলতে এমন একটি সম্প্রদায়কে বোঝায় যারা কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাস করে, যাদের স্বকীয় ভাষা, জীবনধারা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। একটি নৃগোষ্ঠী অন্য নৃগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র এবং তারা তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় সম্পর্কে সচেতন।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

বাংলাদেশের প্রধান নরগোষ্ঠী বাঙালি। তবে আবহমান কাল থেকে এখানে অনেকগুলো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করছে। বাংলাদেশে এখন প্রায় ৫৭ টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে। তবে ২০১১ সালের আদমশুমারিতে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ২৭টি। এ শুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ১.১৩ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। দেশে মোট ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনসংখ্যা হচ্ছে ১৫,৪৮,১৪১ জন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী চাকমা নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা সর্বাধিক (৪,৪৪,৭৪৮জন)। দ্বতীয় অবস্থানে রয়ে মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। এদের সংখ্যা ২,০২,৯৭৪ জন (সূত্রঃ আদম শুমারি ২০১১)।

বাংলাদেশের প্রধান চারটি অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ ক) দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য এলাকা), খ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল গ) মধ্য-উত্তরাঞ্চল এবং ঘ) বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ। এসব অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, মারমা (মগ), মুরং (ম্রো), ত্রিপুরা, সাঁওতাল, গারো, মণিপুরি, রাখাইন, হাজং, ভূঁইয়া, ভূমাজি, রাজবংশী, হোদি, পালোয়া, পাংখো, পাঙন, ডালুই, খরিয়া, সেন্দুজ, কোটস, মাহাতো, খ্যাং, ওঁরাও, সাক, মুণ্ডা, খাসিয়া, তোড়ি, খারওয়ার, বর্মণ, মালো, ব্যোম, খোড়া, কুকি, তঞ্চঙ্গ্যা, লুসাই, কুকি, খুমি, বনযোগী,কাছাড়ি, পাহাড়িয়া ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের প্রতিটি নৃগোষ্ঠী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এদের প্রত্যেকের ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ঐতিহ্য এককথায় সামগ্রিক জীবনধারা অপরাপর জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র। এরা সাধারণত কৃষি, পশুপালন এবং কুটির শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিছু নৃগোষ্ঠীর মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃসূত্রীয়, আবার কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক ও মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ এক জাতিগত বৈচিত্র্যের দেশ। এখানে বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য থাকলেও প্রায় ৫৭টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এ ভূখন্ডকে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের প্রধান চারটি অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ ক) দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য এলাকা), খ) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল গ) মধ্য-উত্তরাঞ্চল এবং ঘ) বৃহত্তর উত্তরবঙ্গ। পার্বত্য অঞ্চলে চাকমা, মারমা, মুরং, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, কুকি প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বাসবাস। পটুয়াখালীতে রাখাইন, ময়মনসিংহে গারো, হাজং এবং রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুরে সাঁওতাল, রাজবংশী নৃগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে “স্বতন্ত্র ইতিহাসের সম্মিলিত অনুভূতি থেকে উদ্ভূত” কে বলেছেন?

ক) জে. হুটন খ) জেরি এন্ড জেরি
গ) রবার্টসন ঘ) ই.বি টেইলর

২। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে বাংলাদেশে মোট কয়টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে?

ক) ১১ টি খ) ১৭ টি
গ) ২৭ টি ঘ) ৩৯ টি

৩। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?

ক) ০.১ শতাংশ খ) ১.১ শতাংশ
গ) ১.১৩ শতাংশ ঘ) ১১ শতাংশ

পাঠ-৪.৫ চাকমা
Chakma

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- চাকমা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- চাকমা সমাজের পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	চাকমা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পাহাড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী চাকমা। চাকমা জনগোষ্ঠী নিজেদের 'চাঙমা'-নামে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। চাকমাদের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতামত প্রচলিত আছে। একটি মতামত অনুযায়ী, চাকমারা চম্পক নগরের অধিবাসী ছিলো। চাকমা লোককাহিনীতে বলা হয়, এক চাকমা রাজপুত দেশজয়ের উদ্দেশ্যে চম্পকনগর থেকে মায়ানমারের আরাকানে গমন করেন এবং নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত আরাকানের বেশকিছু অঞ্চল চাকমারা শাসন করেন। পরে স্থানীয় আরাকানীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রথমে চট্টগ্রাম জেলায় এবং পরে আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে তারা বসতি স্থাপন করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আগমনের পর চাকমারা তুলা চাষের মাধ্যমে প্রথমে মুঘল-সরকার ও পরে বৃটিশ-সরকারের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। বৃটিশ আমলেই চাকমাসহ পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত নৃগোষ্ঠীসমূহ পুরোপুরি কেন্দ্রীয় বৃটিশ সরকারের শাসনাধীনে আসে এবং বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার তাদের জন্য ১৯০০ সালে হিলট্রাক্টস্ ম্যানুয়েল প্রণয়ন করে। এই ম্যানুয়েল অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীসমূহের জন্য প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ম্যানুয়াল পরবর্তীতে সংশোধিত হয়।

আবাস ও ভাষা: চাকমারা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চাকমা বসবাস করে রাঙামাটি জেলায়। এরপর খাগড়াছড়ির স্থান। বান্দরবান ছাড়াও চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলাও অল্পসংখ্যক চাকমা বসবাস করে। বাংলাদেশের বাইরে ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে বেশকিছু চাকমা বাস করে। বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা সর্ববৃহৎ। চাকমাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ (২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী ৪,৪৪,৭৪৮জন)। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, চাকমারা পূর্বে টিবেটো বার্মা ভাষা পরিবারভুক্ত আরাকানি ভাষায় কথা বলত। চাকমাদের লিপিতে আরাকানি অক্ষরের প্রাধান্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে তারা ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষায় কথা বলে। চাকমা ভাষার নিজস্ব লিখিত লিপি রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চাকমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে। এছাড়াও সংগীত ও চলচিত্রেও চাকমা ভাষার ব্যবহার হচ্ছে।

নরগোষ্ঠীগত প্রভাব: চাকমাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তারা উচ্চতায় মাঝারি থেকে বেঁটে। তবে কারো কারো উচ্চতা লম্বাকৃতির। দৈহিক গড়নে বেশ শক্তিশালী। সুঠামদেহের অধিকারী চাকমা নৃগোষ্ঠীর মানুষ পার্বত্য অঞ্চলে চলাচলে অভিজ্ঞ।

বিবাহ ও পরিবার: চাকমা পরিবার পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃসূত্রীয়। ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব পিতা, স্বামী বা অন্য কোনো বয়স্ক পুরুষের হাতে ন্যস্ত থাকে। সম্পত্তি ও বংশমর্যাদার উত্তরাধিকার পিতা থেকে পুত্রের ওপর বর্তায়। যৌথ পরিবার এবং বিস্তৃত পরিবার ব্যবস্থা তেমন পরিলক্ষিত হয় না। পুত্রসন্তানেরা আত্মনির্ভরশীল হলেই তাদের বিয়ে দিয়ে আলাদা বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়। সাধারণত চাকমাদের মধ্যে নিজ বংশে সাত পুরুষের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। চাকমা সমাজে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহের প্রচলন রয়েছে। চাকমা যুবকরা সাধারণত নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে করে থাকে। তবে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমন কোনো নিষেধ নেই। এ সমাজে বর কনের বাড়িতে যায় না। বর পক্ষের লোকজন গিয়ে কনেকে তুলে নিয়ে এসে বরের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান করে। বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা চাকমা সমাজে বিরল।

রাজনৈতিক সংগঠন: পরিবরি চাকমা সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন। এর পরের স্তরগুলি হচ্ছে পর্যায়ক্রমে গোত্তি বা গোজা, আদাম বা পাড়া, গ্রাম বা মৌজা এবং চাকমা সার্কেল। কতগুলো চাকমা পরিবার নিয়ে গঠিত হয় আদাম বা পাড়া। আদামের প্রধানকে বলা হয় কারবারী। চাকমা রাজা গ্রাম বা মৌজা প্রধানের সাথে আলাপ করে কারবারীকে নিয়োগ করেন। কারবারীদের কাজ হল গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সালিশ বিচারকাজে মৌজাপ্রধানকে সহায়তা করা। কারবারীকে কোনো বেতন-ভাতা প্রদান করা হয় না। কতগুলো আদাম মিলে গঠিত হয় চাকমা গ্রাম বা মৌজা। মৌজার প্রধান হেডম্যান। চাকমা রাজার সুপারিশক্রমে স্থানীয় জেলা প্রশাসক হেডম্যান নিয়োগ করেন। হেডম্যানদের প্রধান কাজ সংশ্লিষ্ট মৌজার খাজনা আদায় করা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সালিশের মাধ্যমে গোলোযোগ নিস্পত্তি করা। চাকমা সমাজের কয়েকশত মৌজা বা গ্রাম নিয়ে চাকমা-সার্কেল গঠিত হয়। চাকমা রাজা চাকমা-সার্কেলের প্রধান। চাকমা রাজা বংশপরম্পরায় নিযুক্ত হন। চাকমা সমাজের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করেন। চাকমা রাজা চাকমা সমাজের সংহতির প্রতীক।

চাকমা অর্থনীতি: জীবিকা নির্বাহের জন্য চাকমারা পাহাড়ের ঢালে জুমচাষ করে। এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের জঙ্গল, গাছপালা কেটে শুকানোর জন্য একমাসের মতো রেখে দেয়। এপ্রিল মাসের প্রথম তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। জুম পরিষ্কার করে বৃষ্টি হওয়ার পর ধান, তুলা, শসা, তিল, ভূট্টা ইত্যাদি বীজ একটা বাড়িতে নিয়ে একত্রিত করে দা/কাস্তে/নিড়ানির সাহায্যে ছোট ছোট গর্ত করে তাতে বপন করা হয়। পরবর্তীতে যে ফসল যখন পাকে তখন তা ঘরে তোলা হয়। এই চাষপদ্ধতিতে চাষাবাদই হচ্ছে জুমচাষ। চাকমা সমাজে সমাজে উদ্যানকৃষির প্রসার ঘটেছে এবং উদ্যানকৃষির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফল উৎপাদন করা হচ্ছে। চাকমারা বাঙালিদের কাছ থেকে হালচাষ পদ্ধতি শিখছে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে চাকমারা ধান চাষ করে। কৃষি ছাড়াও তারা হাঁস-মুরগি ও শূকর পালন করে থাকে।

চাকমাদের খাদ্য, পোশাক: চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তা ছাড়া মাছ, মাংস, ফলমুল, ডাল ইত্যাদি তারা খেয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত মদ চাকমাদের অন্যতম সামাজিক পানীয়। চাকমা পুরুষেরা ধুতি ও ঘরে-বোনা কোট পরিধান করে। মাঝে মাঝে পাগড়া (খাবাং) পরে। মেয়েরা 'পিনধান', 'খাদি' ও কখনও কখনও খাবাং এবং শাড়ি-ব্লাউজও পরে থাকে। 'পিনধান' হল ঘরে বোনা কালো রঙের স্কার্ট বা ঘাগরা যার উপরে ও নিচে লাল ডোরাকাটা এবং পাশে সূচিকর্মের নানা নকশা করা থাকে। মাথায় স্কার্ফের মতো কাপড় দেয়।

ধর্ম: চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তাদের বৌদ্ধমন্দির বা বৌদ্ধবিহারের নাম ক্যাং। চাকমা অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে ক্যাং প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। প্রতিটি ক্যাং-এ একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন যিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। প্রদীপ জ্বেলে ফুল, ফল, মিষ্টি ও অন্যান্য উপাচার সহযোগে তারা বুদ্ধের উপাসনা করে। চাকমাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে হিন্দুধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঘরে ঘরে চাকমাদের মধ্যে গঙ্গাপূজা এবং লক্ষ্মীপূজার প্রচলন রয়েছে। গোজেন নামের ঈশ্বরকে তারা খুব ভক্তি করে। তারা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি ও ফসল রক্ষার জন্য মোরগ ও শূকর বলিদান করে পূজা-অর্চনা করে। তারা মাঝে মাঝে ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করে। চাকমাদের কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে পার্বত্য অঞ্চলের অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মানুষ অংশগ্রহণ করে। এছাড়া তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব মাঘীপূর্ণিমা আড়ম্বরের সাথে পালন করা হয়।

চাকমা সম্প্রদায়ের পরিবর্তন: ভারত বিভক্তির পর চাকমা সম্প্রদায়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। এ পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি উপাদান ভূমিকা রেখেছে। এগুলো হচ্ছে:

(ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসন: বৃটিশ আমলে চাকমাসমাজ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতাভুক্ত হয়। পাকিস্তান সরকার ১৯৬০ সালে চাকমা অধ্যুষিত এলাকায় স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এই পরিবর্তনের ফলে চাকমারা তাদের ঐতিহ্যগত নেতৃত্বের স্থলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে থাকে। আগে কোনো সরকারি উন্নয়নমূলক কাজ ঐতিহ্যগত চাকমা-নেতৃত্বের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হত কিন্তু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর এর মাধ্যমেই সম্পাদন করা হয়।

(খ) শিক্ষা: চাকমা অধ্যুষিত গ্রাম ও শহর এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীসংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকাল আধুনিক ও বৈচিত্র্যময় পেশা, যেমন: ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, অধ্যাপক, ঠিকাদার, সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিতে চাকমারা ক্রমবর্ধমান হারে সম্পৃক্ত হচ্ছে। শিক্ষার সম্প্রসারণের ফলে সামাজিক সচলতার হার অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন: চাকমাসমাজে ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা না থাকার কারণে প্রাকৃতিক ভূমি যার যত খুশি অধিকার করে চাষ করতে পারত। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সর্বপ্রথম সমতলভূমি, জুম ও উদ্যান চাষের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেয়া শুরু করে। কাপ্তাই বাঁধের প্রভাবে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ায়, সমতল ভূমির মানুষ পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করায়, পর্যটন সম্প্রসারণের কারনে এবং চাকমা জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্বত্য ভূমির উপর চাপ বাড়ছে।

(ঘ) উৎপাদনকৌশল পরিবর্তন: চাকমাসমাজে উৎপাদনকৌশলে ব্যপক পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে জুমচাষ পদ্ধতির পরিবর্তে জুমচাষের পাশাপাশি সমতলভূমিতে হালচাষ এবং সরকারি উদ্যোগের ফলে উদ্যানচাষ বাড়ছে। পতিত জমির ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঙ) মুদ্রা অর্থনীতির প্রভাব: মুঘলযুগে এমনকি বৃটিশ আমলের শুরুর দিকে চাকমা সমাজে মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলন ছিল না। পরবর্তীতে মুদ্রা অর্থনীতি প্রসার লাভ করে এবং পুজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাহচর্য পেয়ে সমাজ আরও গতিশীল হয়।

(চ) স্থানীয় বাঙালি সমাজের প্রভাব: বাঙালিদের সাথে মিথস্ক্রিয়া বাড়ার ফলে চাকমা-বাঙালি সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় যা চাকমাসমাজে পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। বাঙালি সমাজের প্রভাবে চাকমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরবাড়ির ধরন, আসবাবপত্র, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে।

(ছ) বৌদ্ধধর্মের প্রভাব: বিশ্ববৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সাথে চাকমারা সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং বিশ্ববৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। একটা সময়ে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ি গোষ্ঠীর অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা শান্তিবাহিনী গঠন করে। পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রায় দুই দশকের সশস্ত্র সংগ্রামের পর পাহাড়ে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও শান্তিবাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	চাকমা সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের কারণগুলো চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

পরিসংখ্যান, পরিচিতি ও প্রভাবের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমা। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারী এ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের তিন পার্বত্য জেলায় বসাবাস করে। পিতৃসূত্রীয় পরিবারে চাকমারা প্রধানত জুমচাষে অভ্যস্ত। গ্রামের হেডম্যান এবং সার্কেলের রাজা (চাকমা রাজা) তাদের রাজনৈতিক সংগঠনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী চাকমা সম্প্রদায়ে সাম্প্রতিককালে দৃশ্যমান সামাজিক পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। “ক্যাং” হচ্ছে চাকমাদের–

ক) বৌদ্ধমন্দির খ) পাড়ার নাম

গ) উৎসবের নাম ঘ) কোনোটি নয়

২। কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক চাকমা বসবাস করে?

ক) খাগড়াছড়ি খ) বান্দরবান

গ) রাঙামাটি ঘ) কক্সবাজার

৩। কয়েকটি চাকমা পরিবার মিলে গঠিত হয়–

ক) সার্কেল খ) মৌজা

গ) গোত্র ঘ) আদাম বা পাড়া

পাঠ-৪.৬ মারমা
Marma

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মারমা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবেন।
- মারমা সম্প্রদায়ের পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মারমা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, পাহাড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান।

'ম্রাইমা' শব্দ থেকে মারমা শব্দটির উৎপত্তি। মারমারা 'মগ' নামেও পরিচিত। মারমা নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের একটি অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, যাদের অধিকাংশই পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করে। সংখ্যার দিক থেকে মারমারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে মারমা নৃগোষ্ঠীর ২,০২,৯৭৪ জন মানুষ বসবাস করেন।

আবাস ও ভাষা: মারমারা মূলত রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। তিন পার্বত্য জেলায় তাদের বসবাস পরিলক্ষিত হলেও মূল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ বান্দরবান জেলায় বসবাস করে। এর বাইরে পটুয়াখালি ও কক্সবাজার জেলাও তারা বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ মারমারাই মায়ানমার থেকে আগত। বাংলাদেশ ছাড়াও এ জনগোষ্ঠী ভারত ও মায়ানমারেও বসবাস করে। মারমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বার্মিজ সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে। মারমারা লেখালেখির ক্ষেত্রে তারা বার্মিজ বর্ণমালা ব্যবহার করে। মারমাদের ভাষা তিব্বত-বার্মা ভাষাসমূহের অধীনে বার্মা-আরাকান শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। তবে সাম্প্রতিককালে মারমারা বাংলা ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষাও ব্যবহার করে থাকে। মারমারা বার্মিজ ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে থাকে। তাদের নববর্ষ উদযাপনের অনুষ্ঠানকে সাংগ্রাই বলা হয়।

জাতিগত উৎপত্তি: মারমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। তারা মূলত মায়ানমারের আরাকানিদের বংশধর। মারমা সম্প্রদায়ের গয়ের রঙ হলদে ফর্সা, উচ্চতা তুলনামূলকভাবে খাটো, নাক বোঁচা, কালো চুল ও ছোট চোখ। ১৪ থেকে ১৭ শতকে বার্মিজরা আরাকান জয় করলে মারমারা আরাকান থেকে বিতাড়িত হয়। তখন তারা থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। মায়ানমারের প্রাচীন পেগুসিটি হল মারমা সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান।

বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা: মারমাদের পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। মারমা পরিবারের প্রধান পিতা হলেও পারিবারিক কাজকর্মে মাতার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক পুরুষটি মারমা পরিবারের প্রধান হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মারমা পরিবার সাধারণত একক পরিবার। পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তারা প্রাচীন বার্মিজ প্রথা অনুসরণ করে যাকে 'থামোতাদা' (Thamohada) বলা হয়। পুত্র এবং কন্যা যে কেউই পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সাধারণত সবচেয়ে প্রিয় সন্তানটিই গৃহের মালিকানা লাভ করে এবং পিতামাতাকে দেখাশোনা করে। মারমা সম্প্রদায়ে সাধারণত একবিবাহ ব্যবস্থাই প্রচলিত। তবে বহুবিবাহ প্রথা ও দেখা যায়। নারী এবং পুরুষ উভয়েরই বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রয়েছে। তবে এ ব্যাপারে হেডম্যান বা কারবারির বিচারই চূড়ান্ত। মারমা সমাজে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ দুই ধরনের বিবাহ প্রথাই প্রচলিত। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মারমরা নারীদেরকে স্বাধীনতা দেয়।

ধর্ম: মারমারা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। প্রায় প্রত্যেকটি মারমা গ্রামে বৌদ্ধ বিহার 'কিয়াং' এবং বৌদ্ধভিক্ষু ''ভান্তে'দের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। মারমারা বৈশাখী পূর্ণিমা, আশ্বিনী পূর্ণিমা, কার্তিকী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ দিনগুলোতে বৌদ্ধ মন্দিরে গিয়ে ফুল দিয়ে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে বুদ্ধের বন্দনা করে থাকে। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদের মত মারমারাও Theravada Buddhism-এ বিশ্বাসী। তারা বিভিন্ন দেবতার অর্চনা করে থাকে। মারমা নৃগোষ্ঠীর একটি অংশ

সর্বপ্রাণবাদ (Animism) চর্চা করে, যাদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম ''খাদুত্যিয়াং'' (Khaduttiang)। মারমারা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাস করে। এজন্য তারা বিভিন্ন রীতি ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ শক্তিকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে।

অর্থনীতি: কৃষি নির্ভর মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা কৃষি। সাধারণত তারা জুমচাষ করে। মারমা নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বসতবাড়িভিত্তিক ছোট আকারের বাগানকৃষি দেখা যায়। এছাড়াও তারা ঝুড়ি এবং চোলাই মদ তৈরি করে। মারমা নারীরা বস্ত্র তৈরিতে পারদর্শী।

রাজনৈতিক সংগঠন: মারমা সমাজ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত। মারমা সমাজের প্রধান হলেন বোমাং চিফ বা বোমাং রাজা। মারমা সমাজ কতগুলো মৌজায় বিভক্ত। প্রত্যেক মৌজায় কতগুলো গ্রাম রয়েছে। মারমা ভাষায় এ গ্রামকে বলা হয় 'রোয়া'। গ্রামবাসী দ্বারা গ্রামের প্রধান মনোনীত হয়, যাকে 'রোয়াজা' বলা হয়। মারমাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঐতিহ্যগতভাবে ত্রিমাত্রিক। তাদের গ্রাম/পাড়া, মৌজা এবং সার্কেলের প্রধানকে যথাক্রমে কারবারি, হেডম্যান এবং রাজা বা সার্কেল চিফ বলা হয়। এই প্রশাসনিক প্রধানগণ আইন প্রয়োগ, ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা এবং সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখতে ভূমিকা পালন করেন।

খাদ্যাভ্যাস, স্থাপত্যরীতি ও পোশাক: মারমারা ভাত, মাছ, মাংস এবং নানা ধরনের শাক-সবজি খেয়ে থাকে। সিদ্ধ শাক-সবজির সাথে মরিচ মিশিয়ে প্রস্তুত করা 'তোহজা' তাদের একটি প্রিয় খাবার। শুটকি মাছ থেকে প্রস্তুতকৃত 'নাপ্পি' বা 'আওয়াংপি' তাদের আরেকটি পছন্দের খাবার। মারমারা বাঁশ, কাঠ ও ছন দিয়ে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। কয়েকটি বাঁশের খুঁটির উপর মাটি থেকে ৬-৭ ফুট উপরে তাদের ঘরবাড়ি নির্মিত হয়। বাঁশ বা কাঠের উঁচু ভিতের উপর নির্মিত ঘরবাড়িকে 'মাচাং' বলা হয়। গৃহপালিত পশু রাখা, জ্বালানি কাঠ সংরক্ষণ, জুমের ফসল রাখা ইত্যাদি কাজে তারা মাচাং ব্যবহার করে থাকে।

মারমা নারী পুরুষেরা পোশাক পরিচ্ছদে পরিপাটি। মারমা পুরুষেরা গায়ে জামা ও লুঙ্গি পরে। পুরুষেরা মাথায় 'গবং' নামক পাগড়ি পরে। মারমা নারীরা 'আনিঞ্জ' নামক এক ধরনের ব্লাউজ পরে। এছাড়াও মারমা নারীরা 'রাংকাই' ও 'থামি' নামের দুটি বিশেষ ধরনের পোশাক পরে থাকে। বর্তমানে মারমা নারীও পুরুষ উভয়েই লুঙ্গি পরে থাকে। মারমারা ঐতিহ্যবাহী বুনন প্রযুক্তির সাহায্যে নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরি করে থাকে।

মারমা সম্প্রদায়ের পরিবর্তন: গত কয়েক দশকে মারমা সম্প্রদায়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। যেসব কারণে চাকমাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সেসব কারণে মারমা সম্প্রদায়েও পরিবর্তন ত্বরান্বিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে, শিক্ষা, নগরায়ন, মুদ্রা ও বাজার অর্থনীতি, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নতি, শান্তি চুক্তিসহ সরকারি নানা উদ্যোগ মারমা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মারমা সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মারমারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। তারা মূলত মায়ানমারের আরাকানিদের বংশধর। তিন পার্বত্য জেলা রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে তাদের বসবাস। তবে মূল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ বসবাস করে বান্দরবান জেলায়। এর বাইরে পটুয়াখালি ও কক্সবাজার জেলাও তারা বসবাস করে। বাংলাদেশ ছাড়াও এ জনগোষ্ঠী ভারত ও মায়ানমারেও বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ মারমারাই মায়ানমার থেকে আগত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মারমাদের আদি নিবাস কোথায়?

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম খ) আরাকান গ) ত্রিপুরা ঘ) মালদহ

২। মারমাদের নববর্ষ উৎসবের নাম কী?

ক) বৈসাবী খ) রাংকাই গ) রোয়া ঘ) সাংগ্রাই

পাঠ-৪.৭ ত্রিপুরা ও গারো
Tripura and Garo

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- গারো সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ত্রিপুরা, গারো, পাহাড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দু'টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে ত্রিপুরা এবং গারো। লোক সংখ্যার দিক থেকে ত্রিপুরারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। ত্রিপুরারা বাংলাদেশের পাহাড়ি ও সমতল উভয় অঞ্চলেই বসবাস করে। তবে চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে তাদের বসতি বেশি। ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক থেকে ত্রিপুরারা সমৃদ্ধ। ভারতীয় উপমহাদেশের ত্রিপুরা জাতি একটি আদি ও ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠী। এদের একটি অংশ বাংলাদেশে বসবাস করে। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এরা বাংলাদেশে আগত বলে জানা যায়।

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত পরিচয়: ত্রিপুরা জাতি ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি শক্তিশালী নৃগোষ্ঠীরূপে পরিচিত ছিল। ত্রিপুরারা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত। 'টিপরা' নামেও এদের পরিচিতি রয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পূর্বসুরীগণ মঙ্গোলিয়া থেকে মধ্য এশিয়ার তিব্বত ও সাইবেরিয়ার পথ পরিক্রমণ করে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে আগমন করে। বাংলাদেশে বসবাসরত ত্রিপুরাদের আদি বাসস্থান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। সেখান থেকে তারা এদেশে আগমন করেছে। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ত্রিপুরা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের সাথে যুক্ত হয়। ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠী অনার্য। এরা মাঝারি গড়নের অধিকারী। এদের গায়ের রং উজ্জ্বল, নাক বোঁচা, চোখ ছোট এবং চুল খাড়া হয়ে থাকে।

বাসস্থান, ভাষা: বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, ফরিদপুর, শ্রীমঙ্গল, মৌলভিবাজার, কুমিল্লা, কক্সবাজার প্রভৃতি জেলাসমূহে ত্রিপুরারা বসবাস করে। তবে ত্রিপুরাদের প্রায় ৮০ শতাংশের বসবাস পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ করে রামগড় এবং খাগড়াছড়িতে। ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ককবরক `kok-borok'। এ ভাষাটি 'বোডো' দলের (`bodo group') অন্তর্ভুক্ত। সিনো-টিবেটান (Sino-Tibetan) পরিবার ভুক্ত টিবেটো-বার্মা (Tibeto-Burma) ভাষার আসাম শাখা থেকে ককবরক ভাষাটির উৎপত্তি। ককবরক ভাষার নিজস্ব অক্ষর-লিপি রয়েছে।

পরিবার, বিবাহ ও ধর্ম: ত্রিপুরাদের পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় পিতাই পরিবারের প্রধান। পিতার অবর্তমানে পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক পুত্র পরিবারের প্রধান হয়। সন্তান পৈতৃক সূত্রে বংশ পরিচয় লাভ করে থাকে। তবে তাদের কিছু গোত্রে মেয়েরা মাতৃবংশ পরিচয় লাভ করে থাকে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্রাধিকার পায়। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীদের মধ্যে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথাগতভাবে ত্রিপুরাদের নিজ গোত্রের মধ্যে বিবাহ অনুমোদিত নয়। যৌতুক প্রথা এ সমাজে নিষিদ্ধ। বরের পিতাকে কনের পোষাক-পরিচ্ছদ, অলংকারের খরচ বহন করতে হয়। ত্রিপুরাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত। বহুবিবাহ এ সমাজে দেখা যায়। তবে তা প্রথাগতভাবে নিন্দনীয়। ত্রিপুরারা সনাতন হিন্দু ধর্মের অনুসারী। সনাতন ধর্মালম্বী হলেও বেদে বর্ণিত সকল দেব-দেবীর পূজা এ সমাজে হয় না। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী শিব এবং কালীসহ ১৪ জন দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করে থাকে।

সমাজ ব্যবস্থা, পোশাক, অর্থনীতি: ত্রিপুরা নৃগোষ্ঠীর 'সমাজ'কে দফা (দল) বলা হয়। ত্রিপুরারা মোট ৩৬টি দফায় বিভক্ত। এর মধ্যে ১৬টি দফা বাংলাদেশে বসবাস করে। প্রত্যোকটি দফার নিজস্ব পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-প্রথা ও অলংকার রয়েছে। ত্রিপুরা পুরুষেরা ধূতি পরে থাকে। তারা মাথায় পাগড়ি/টুপি পরিধান করে। ত্রিপুরা নারীরা শীরের উর্ধ্বাংশে ব্লাউজ এবং নিম্নাংশে সায়া পরিধান করে। ত্রিপুরা নারী-পুরুষ উভয়েই রূপা নির্মিত বক্স

চন্দ্রাকৃতির কানের দুল পরে থাকে। ত্রিপুরা সমাজের অবিবাহিত মেয়েরা রঙিন জামা-কাপড় পরে থাকে। ত্রিপুরা নারীরা বেংকি, বালা, কুনচি, আঁচলী, রাংবাতার, সুরমা, ওয়াকুম ইত্যাদি অলংকার পরিধান করে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ত্রিপুরাদের অর্থনীতি জুমচাষ, পশু পালন ও হালচাষের উপর নির্ভরশীল। খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ত্রিপুরা চাকুরি ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। ত্রিপুরাদের মধ্যে বাগান চাষও প্রচলিত। এদের মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুবই কম। জুমের উপর ভিত্তি করেই ত্রিপুরা সমাজের অর্থনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাদের মূল্যবোধ, বাদ্য-গীত, পোষাক-পরিচ্ছদ, গান, ছড়া, গল্প ইত্যাদির উপর জুম চাষের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, জুম ও কৃষি কাজের জন্য পর্যাপ্ত জমির অভাব ইত্যাদি কারণে ত্রিপুরাদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার বেশি।

সংস্কৃতি: ত্রিপুরা লোকসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। ত্রিপুরাদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণে, বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, গীত এবং বাদ্যযন্ত্র অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। তাদের ঐতিহ্যবাহী কতিপয় নৃত্য হচ্ছে, গড়িয়া নৃত্য এবং বোরপূজা নৃত্য। ত্রিপুরাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান হল বৈসুকি বা বৈস, যা মূলত বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। এই উৎসব তিন দিন ধরে উদযাপন করা হয়। এ দিনে বাড়ি ঘর ফুল দিয়ে সাজানো হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

গারো (মান্দি)

নৃগোষ্ঠী হিসাবে 'গারো'দের নামকরণ নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে। একটি মত অনুসারে, গারো পাহাড়ের নামানুসারে 'গারো' নামকরণ করা হয়। অন্য মতে বলা হয়েছে, গারো নৃগোষ্ঠীর নামানুসারে 'গারো পাহাড়' নামকরণ হয়েছে। গারোরা নিজেদেরকে মান্দাই/মান্দি নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। গারো ভাষায় মান্দি অর্থ মানুষ। গারো এথনিক সম্প্রদায় দুই শ্রেণিভূক্ত; যথা- ক) অচ্ছিক গারো ও খ) লামদানি গারো। বাংলাদেশে প্রধানত লামদানি গারোরা বাস করে।

পরিচয়, ভাষা ও অবস্থান: গারোরা ভারতের আসাম প্রদেশের আদি বাসিন্দা। চেহারার দিক থেকে তারা আসামের খাসিয়া, নাগা ও মণিপুরীদের উত্তরাধিকারী। গারোদের মধ্যে মঙ্গোলয়েড নৃগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এদের শরীর লোমহীন, মুখমন্ডল গোলাকার, নাক প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা, প্রায় দাড়িবিহীন; ঠোঁট মোটা, ভারী ও ভুরু; কপাল ক্ষুদ্রাকৃতির, চুল কালো, সোজা ও ঢেউ খেলানো; গায়ের রং ফর্সা।

গারোদের ভাষার নামও মান্দি বা গারো ভাষা। এ ভাষার মধ্যে বাংলা ও আসামি ভাষার মিশ্রণ রয়েছে। এদের ভাষা মূলত সিনো-টিবেটান ভাষার অন্তর্গত, যা বোডো বা বরা ভাষা উপগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এ ভাষার নিজস্ব কেনো লিপি বা অক্ষর নেই। ফলে এ ভাষার লিখিত কোনো রূপ নেই। বাংলাদেশের গারোরা বাংলা হরফে লিখছে।

গারোদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে বসবাস করে। বাংলাদেশের গারো পাহাড়ের পাদদেশে ময়মনসিংহ জেলার নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, শ্রীবর্দী এলাকায় লামদানি শ্রেণির গারো বাস করে। এছাড়া টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর পাহাড়ি অঞ্চলেও অনেক গারোর বসবাস রয়েছে।

পরিবার, বিবাহ ও ধর্ম: গারো পরিবার মাতৃতান্ত্রিক। পরিবারের সকল কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মাতা বা স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে। সে কারণে গারো পরিবারে ও সম্প্রদায়ে পুরুষের প্রাধাণ্য কম। এ সমাজে উত্তরাধিকার মাতৃধারায় মা থেকে মেয়েতে বর্তায়। এখানে মাতৃবাস রীতি অনুসরণ করা হয়। বিয়ের পর গারো দম্পতি স্ত্রীর মায়ের বাড়িতে বসবাস করে। ইদানীং শিক্ষিত গারো-দম্পতিদের মধ্যে এর বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। গারো সম্প্রদায়ে একক বিবাহভিত্তিক পরিবার বিদ্যমান। খ্রিষ্ঠান গারোদের বিয়ে চার্চে অনুষ্ঠিত হয়। আর অন্য গারোদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী নিয়মে। বাংলাদেশে বসবাসরত গারো সম্প্রদায়ের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। এদের ঐতিহ্যগত ধর্মের নাম সাংসারেক। বর্তশানে শতকরা প্রায় ৮ ভাগ সাংসারেক ধর্মের অনুসারী এবং বাকি ২ ভাগ ইসলাম ও হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। গারোসমাজে ব্যবহৃত 'সাংসারেক' শব্দটি সম্ভবত এসেছে বাংলা সংসার থেকে। জগৎ সংসার বোঝাতেই সাংসারেক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছ। সংসার, পরিবার, খানা অর্থাৎ জাগতিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই গারোদের ধর্ম। গারোরা

ঐতিহ্যগতভাবে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তারা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করে, যাকে মাইতে বলে উল্লেখ করা হয়। এই মাইতে বলতে দেবদেবী এবং প্রেতাত্মা উভয়কে বুঝায়। গারোদের প্রধান পূজার নাম 'ওয়ানগালা'।

সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, ক্ষমতাকাঠামো ও সমাজ পরিবর্তন: আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি, গারো সম্প্রদায় মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা অনুসরণ করে। তাদের সর্ববৃহৎ পরিসরের মাতৃসূত্রীয় গোত্রের নাম চাটচি, যার অর্থ জ্ঞতি বা আত্মীয়স্বজন। যারা এই গোত্রভুক্ত তারা সবাই একে অন্যের সাথে মাতৃসূত্রীয় রীতিতে সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের গারোরা একসময় জুমপদ্ধতিতে চাষ করত। কিন্তু ১৯৫০ সালে তৎকালীন সরকার জুমচাষের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরপ করে। এতে তারা জুমচাষের পরিবর্তে হালকৃষিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, নানাপ্রকার সবজি ও আনারস অন্যতম। তাছাড়া, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেও তারা অর্থ উপার্জন করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই হাটবাজারে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে। গারো নারীদের একটি অংশ শহরে বিউটি পার্লারে রূপসজ্জা কর্মী হিসেবে কাজ করে।

গারো সমাজের ক্ষমতাকাঠামোয় গ্রামপর্যায়ের নেতৃত্বে রয়েছেন গ্রামপ্রধান। এ সমাজে গ্রামপ্রধান ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সালিশ ও বিচারকার্য পরিচালনা করেন। গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় স্থানীয় সরকারব্যবস্থা, যেমন– ইউনিয়ন পরিষাদ, উপজেলা পরিষদইত্যাদি গড়ে উঠেছে। ঐতিহ্যবাহী গারো নেতৃত্বের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার নেতৃত্ব জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

গারোদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে খ্রিস্টান মিশনারিদের আগমনের ফলে গারোরা ব্যপকভাবে খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত হয়। গারো অঞ্চলে মিশনারিদের ব্যবস্থাপনায় অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষিত গারোরা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হওয়ায় তাদের মধ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতাভুক্ত হওয়ার ফলে গারোসমাজে গ্রাম প্রধানের ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছ।

শিক্ষার্থীর কাজ	গারো সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মানুষ একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা পাহাড় এবং সমতলে উভয় স্থানে বসবাস করে। গারোরা মূলত সমতলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী। উভয় নৃগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভুত। ভারতের ত্রিপুরা এবং আসাম থেকে তারা এ ভূখন্ডে এসেছে। ত্রিপুরারা পিতৃসূত্রীয় হলেও গারোরা মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থার অনুসারী। উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। ত্রিপুরারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও গারোদের বেশির ভাগ ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে বসবাসরত ত্রিপুরাদের আদি বাসস্থান কোথায়?
- ক) ভারতের ত্রিপুরা — খ) আসাম
- গ) নেপাল — ঘ) রাঙামাটি

২। ত্রিপুরারা মূলত কোন ধর্মের অনুসারী?
- ক) ইসলাম ধর্ম — খ) বৌদ্ধ ধর্ম
- গ) হিন্দু ধর্ম — ঘ) খ্রিস্টান ধর্ম

৩। 'ওয়ানগালা' কী?
- ক) ত্রিপুরাদের প্রধান উৎসব — খ) মন্দিরের নাম
- গ) বর্ষবরণ উৎসব — ঘ) গারোদের প্রধান পূজা

পাঠ-৪.৮ সাঁওতাল
Santal

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবনযাপন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সাঁওতাল, সমতল, বরেন্দ্র অঞ্চল, কৃষিজীবী, পিতৃতান্ত্রিক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম সাঁওতাল। সাঁওতাল নামকরণের বিষয়ে সর্বসম্মত কোনো তথ্য নেই। ভারতের সাঁওতাল পরগনার অধিবাসী হওয়ায় এ নামকরণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করার পর ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৬ সালে সাঁওতালদের স্থায়ী এলাকা নির্ধারণ করে দেয়। 'দামনি কো'নামের এই এলাকাটি পরবর্তীতে সাঁওতাল পরগনা নামে পরিচিতি লাভ করে। সাঁওতাল ভাষায় 'দামনি'- শব্দের অর্থ অঞ্চল এবং 'কো'- শব্দের অর্থ পাহাড়। সাঁওতালরা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ও আবাস: নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা, সাঁওতালরা আদি অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীভুক্ত। এদের চেহারা কালো, নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট মোটা, চুল কোঁকড়ানো এবং দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। এজন্য এদেরকে প্রাক-দ্রাবিড়ীয় বলেও মনে করা হয়। সাঁওতালরা ১২টি গোত্রে বিভক্ত। তার প্রথম সাতটি পিলচু হড়ম ও পিলচু বুড়ির সাত জোড়া সন্তান থেকে উৎপন্ন এবং অবশিষ্ট পাচটি গোত্র পরবর্তীকালে উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। উইলিয়াম হান্টারের মতে, অবশিষ্ট ৫টি গোত্র সংকর বর্ণের। অর্থাৎ আর্য পিতা ও সাঁওতাল মাতা থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় দুই লক্ষের বেশি সাঁওতাল বসবাস করেন। এদের মূল আবাসস্থল রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চল। অর্থাৎ রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জে অধিকাংশ সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর বসবাস। বগুড়া, রংপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং বৃহত্তর সিলেট জেলায়ও সাঁওতালদের বসবাস রয়েছে। সিলেট অঞ্চলের চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের একটি অংশ সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে মনে করা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে বনজঙ্গলের পতিত জমিতে সাঁওতালরা বসবাস শুরু করে। পরে পতিত জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ আরম্ভ করে।

ভাষা, ধর্ম, পরিবার ও বিবাহ: সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এ ভাষা দুটি উপভাষায় বিভক্ত, ক) কারমেলি ও খ) মাহলেস। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, সাঁওতাল ভাষা মুন্ডারী ভাষার উপভাষা। আবার নৃবিজ্ঞানী হডসন মনে করেন, কোল ভাষার উপভাষা হচ্ছে সাঁওতাল ভাষা। বাঙালিদের প্রভাবে তারা মাতৃভাষার সাথে বাংলাভাষাও গ্রহণ করেছে। সময়ের পরম্পরায় সাঁওতাল ভাষার সাথে হিন্দি, মারাঠী, তেলুগু তামিল ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানত হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। সনাতন ধর্মে বিশ্বাসীরা হিন্দুধর্মের রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অন্যরা খ্রিস্টান ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। সাঁওতালদের প্রধান গ্রামদেবতার নাম 'মারাংবুরো'। এই দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে সাদা মোরগ ও সাদা ছাগল উৎসর্গ করা হয়।

সাঁওতালদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত। পিতাই পরিবারের প্রধান। সাঁওতালদের মধ্যে বর্তমানে একক বা অনুপরিবার লক্ষ করা যায়। সাঁওতালদের মধ্যে পিতার সম্পত্তিতে পুত্রের সমান অধিকার থাকে। কিন্তু পিতার সম্পত্তিতে কন্যাসন্তানের কোনো অধিকার নেই। সাঁওতালদের মধ্যে একক বিবাহ প্রচলিত। তবে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। সাধারণত ছেলেরা ১৯/২০ এবং মেয়েরা ১৫/১৬ বছর বয়সে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক) এবং একাধিক বিবাহ প্রচলিত আছে।

খাদ্য, অর্থনীতি, পোশাক ও সমাজ পরিবর্তন: ভাত সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য। ভাতের সাথে ডাল এবং শাক-সবজি তারা খায়। তাছাড়া শূকর, মুরগি, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, গুঁইসাপ, পাখি, লাল পিঁপড়া ইত্যাদি তাদের পছন্দের খাবার। উৎসব-অনুষ্ঠান এবং নৃত্যের সময় তারা চাউল থেকে তৈরি 'হাড়িয়া' নামক মদ পান করে।

সাঁওতাল অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। ভূমিহীন হওয়ার কারণে ৯০ শতাংশ সাঁওতাল কৃষিশ্রমিক হিসাবে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে। মহিলা-পুরুষ উভয়ই মাঠে কাজ করে। কৃষি ছাড়াও জেলে, কুলি, দিনমজুর, চা-শ্রমিক, রিকশা-ভ্যানচালক প্রভৃতি কাজে সাঁওতাল নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়।

সাঁওতাল মেয়েরা সাধারণত কাঁধের উপর জড়িয়ে শাড়ি পরে। তবে ঘোমটা দেয় না। মেয়েরা হাতে রাং, লোহা কিংবা শাঁখের বালা পরে। পুরুষেরা লুঙ্গি পরে। কোনো কোনো পুরুষ গলায় মালা ও হাতে বালা ব্যবহার করে। পুরুষ ও বালকদের ধুতি পরতে দেখা যায়।

সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষিতের হার খুব কম। ইদানিং তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কোনো কোনো সাঁওতাল এলাকায় তাদের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কারণে সাঁওতাল সমাজে পরিবর্তন এসেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে সাঁওতাল। সমতলের এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রধানত বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের মূলত কৃষিজীবী। তবে ভূমিহীন হওয়ায় অধিকাংশ সাঁওতাল কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। নিজস্ব ভাষা থাকলেও তাদের মধ্যে শিক্ষার হার খুবই কম। তবে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় তারাও ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সাঁওতালরা কয়টি গোত্রে বিভক্ত?

ক) ১০টি
খ) ১২টি
গ) ১৫টি
ঘ) ১৮টি

২। ' কারমেলি' ও ' মাহলেস' কী?

ক) সাঁওতাল ভাষার দু'টি উপভাষা
খ) সাঁওতালদের ধর্ম
গ) সাঁওতালদের গোত্র
ঘ) সাঁওতালদের উৎসব

৩। 'মারাংবুরো' কী?

ক) সাঁওতালদের বর্ষবরণ
খ) সাঁওতালদের মন্দিরের নাম
গ) সাঁওতালদের বিবাহপ্রথা
ঘ) সাঁওতালদের প্রধান গ্রামদেবতা

পাঠ-৪.৯ মণিপুরি ও রাখাইন
Manipuri and Rakhine

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মণিপুরি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- রাখাইন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মণিপুরি, রাখাইন, সমতল, সিলেট, পটুয়াখালী, কক্সবাজার, আরাকট, মণিপুর।

বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের অন্যতম প্রধান দু'টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হচ্ছে মণিপুরি এবং রাখাইন। উভয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এ ভূখণ্ডে বাহিরাগত। মণিপুরিরা ভারতের আসাম সংলগ্ন মনিপুর অঞ্চল এবং রাখাইনরা মায়ানমারের আরাকান অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে প্রবশে করেছিল। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে বর্তমানে তারা বাংলাদেশের অধিবাসী।

মণিপুরি সম্প্রদায়ের নৃতাত্ত্বিক ও জাতিগত পরিচয়: সাধারণত মণিপুর রাজ্যের অধিবাসীদেরকে 'মণিপুরি' বলা হয়। ভারতের আসাম সংলগ্ন 'মণিপুর' রাজ্য থেকে উদ্বাস্তু হয়ে **১৭৫৬, ১৭৫৮** এবং **১৮৯১** সালে মণিপুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। লোককথায় প্রচলিত আছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুর রাজ্যের এক রাজপুত্র মণিপুর থেকে পালিয়ে সফরসঙ্গীসহ সিলেটে চলে আসেন। ধারণা করা হয় যে, এরাই হচ্ছে বাংলাদেশের বর্তমান মণিপুরিদের পূর্বপুরুষ।

মণিপুরিরা কোনো নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা মুশকিল। তবে দেহের গঠন ও মুখমন্ডলের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এদের সাথে চীনা ও বার্মিজদের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তাই এদেরকে আদি-মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। ধারণা করা হয় যে, মণিপুরিরা ভারতের আসামরাজ্যের কুকি জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের পূর্বপুরুষের নাম 'পাখাংবা'। প্রবাদ আছে যে, পাখাংবা একজন সর্পপুরুষ ছিলেন। অরণ্যে গর্তের ভিতর থেকে একজন সুপুরুষ যুবক হিসাবে তিনি বেরিয়ে আসেন। জনপথে হাঁটার সময় জুমচাষরত এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে বিয়ে করে সংসারজীবন শুরু করেন। এই দম্পতি থেকে মণিপুরি জাতিগোষ্ঠীর উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।

ভাষা, ধর্ম ও আবাস: মণিপুরিদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। মণিপুরি ভাষার দু'টি উপবিভাগের একটি হচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া, অপরটি হচ্ছে মৈতৈ ভাষা। বিষ্ণুপ্রিয়ার সাথে অহমিয়া, উড়িয়া বাংলা ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিজস্ব বর্ণলিপি আছে। তবে উৎপত্তিগত দিক থেকে এটি মাগধি-প্রাকৃত থেকে আগত। মৈতৈ মণিপুরিদের ব্রহ্মীয় ভাষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারো কারো মতে, মণিপুরিদের ভাষার সাথে কুকীদের ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে।

মণিপুরিরা হিন্দু ধর্মের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাক্ষণ পুরোহিত দিয়ে তারা পূজা করে থাকে। সাধারণত তাদের মন্দিরে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেব এবং শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গের মূর্তি দেখা যায়।

বাংলাদেশের মণিপুরি সম্প্রদায় সিলেটের তামাবিল, মৌলভীবাজারের ভানুগাছ এবং হবিগঞ্জের আসামপাড়া এলাকায় বসবাস করে। এছাড়া ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় কিছুসংখ্যক মণিপুরি বাস করে।

বিবাহ, পরিবার ও অর্থনীতি: মণিপুরিদের মধ্যে বর্হিগোত্র বিবাহ প্রচলিত আছে। একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে এখানে নিষিদ্ধ। তাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই। তবে তালাক ও বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। মণিপুরিদের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক এবং পিতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত। ছেলেরা পিতার সম্পত্তিতে সমান ভাগ পেলেও মেয়েদের কোনো অধিকার নেই। তবে পিতা ইচ্ছা করলে তার মেয়েকে সম্পত্তি দান করতে পারেন। কোনো দম্পতির পুত্রসন্তান না থাকলে মেয়ে পিতার সম্পত্তির পূর্ণ উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হয়। এদের মধ্যে একক বা অনুপরিবার বেশি পরিলক্ষিত হয়।

মণিপুরিরা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। নারী-পুরুষ উভয়ই কৃষিক্ষেতে কাজ করে। পাহাড়ি এলাকার মণিপুরিরা জুম পদ্ধতিতে এবং সমতলবাসীরা হালচাষ করে। নারী-পুরুষ সবাই কৃষিকাজে দক্ষ। কৃষিকাজ ছাড়াও তারা কাপড় বোনা ও তাঁত পরিচালনায় পারদর্শী। তারা নিজেদের পোশাক নিজেরাই তৈরি করে। পুরুষরা সাধারণত ধুতি এবং মেয়েরা বুক আবৃত করে লুঙ্গি পরিধান করে থাকে। ব্যবসা, দোকান পরিচালনা, চাকরি প্রভৃতি কাজেও মণিপুরি ছেলেমেয়েরা সম্পৃক্ত হয়।

জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি: মণিপুরি নৃগোষ্ঠী বিভিন্ন জ্ঞাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রধান দু'টি জ্ঞাতিগোষ্ঠী হচ্ছে ভাষার ভিত্তিতে। একটি বিষ্ণুপ্রিয়া, অপরটি মৈথৈ। এছাড়াও মৈরাং, লুয়াং, অমংগোম, ক্ষুমল, নিংথৌজা, খরা, নংবা ইত্যাদি জ্ঞাতিগোষ্ঠী পরিলক্ষিত হয়। মণিপুরীদের লোকসংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে মণিপুরি নৃত্য ও সংগীত জাতীয়ভাবে সমাদৃত। মণিপুরিদের প্রধান খাদ্য ভাত। তা ছাড়া মাছ ও শাক-সবজি তাদের খাদ্য তালিকায় থাকে। মণিপুরিরা নিজেদের পোশাক নিজেরা তৈরি করে। বাঙালি সমাজের প্রভাবে মণিপুরি মেয়েরা তাদের ঐতিহ্যবাহী লুঙ্গির পরিবর্তে কেউ কেউ শাড়ি পরছে। তাদের আচার-আচরণ ও রীতিনীতিতে আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে এবং এ সমাজে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মণিপুরি সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

রাখাইন

সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে রাখাইন অন্যতম। তবে পাহাড়ের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মারমাদের সাথে ভাষা নৃতাত্ত্বি সাদৃশ্য রয়েছে। মারমারা যেমন 'মগ' নামে পরিচিত, তেমনি রাখাইনরাও। প্রাচীনকালে এরা 'মগধ' রাজ্যে বসবাস করত বলে ইতিহাসে এরা 'মগ' নামে পরিচিতি লাভ করে। রাখাইন শব্দের উৎপত্তি পালি ভাষা থেকে। এ ভাষায় 'রাখাইন' শব্দের অর্থ হল রক্ষণশীল অর্থাৎ যারা নিজেদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিচয় ইত্যাদিকে সংরক্ষণ করতে সচেষ্ট থাকে। সম্প্রদায়গত দিক থেকে থেকে রাখাইনরা অনেকটা রক্ষণশীল। রাখাইনরা নিজেদেরকে 'রাক্ষাইন' এবং তাদের বাসভূমিকে 'রাক্ষাইন পি' (রাখাইন ভূমি) নামে অভিহিত করে। এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ভূমি সংরক্ষণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষা ও আবাস: রাখাইনদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ। তারা 'মগধ' রাজ্য থেকে মায়ানমারের আরাকান রাজ্যে বসবাস শুরু করে। ১৭৮৪ সালে বার্মিজ রাজা 'বোদোপ্রা' আরাকান রাজ্য জয় করলে বিপুলসংখ্যক রাখাইন সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালী এবং কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। রাখাইনরা মঙ্গোলীয়দের ভোটবার্মি (Bhotbormi) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। রাখাইনদের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাক বোঁচা, চুলকালো এবং দেহের রং হালকা বাদামি ও উচ্চতায় খাটো।

রাখাইনদের ভাষা ভোটবার্মি দলের ভাষার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ভারতের আদি ব্রাহ্মীলিপি থেকে রাখাইন বর্ণমালার উৎপত্তি। রাখাইনরা কয়েক হাজার বছর আগে মগধে মৌখিকভাবে এই ভাষার উৎপত্তি ঘটায় বলে ধারণা করা হয়। প্রায় ছয় হাজার বছর আগে পাথরে খোদাই করা শিলালিপিতে রাখাইন বর্ণমালা পাওয়া যায়। এটি প্রথম রাখাইন বর্ণমালার উদ্ভবের দলিল। বাংলাদেশের রাখাইনরা বাংলা ভাষায়ও পারদর্শী।

বাংলাদেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় তাদের বসবাস। পটুয়াখালির কুয়াকাটা ও খেপুপাড়ায় রাখাইনদের বসতি রয়েছে।। কক্সবাজারের রামু, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, মানিকছড়ি, টেকনাফ ও চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলাতেও রাখাইনদের বসতি লক্ষ করা যায়।

অর্থনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি: রাখাইনদের প্রধান পেশা কৃষি ও মৎস্য শিকার। এছাড়া তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, তাঁত বুনন, নৌকা নির্মাণ ও অন্যান্য কারিগরি পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। হস্তচালিত তাঁত থেকে কাপড় বোনার কাজে রাখাইনরা দক্ষ। রাখাইনরা লবণ এবং গুড় তৈরি করে। কৃষিকাজে রাখাইন নারী-পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করে। রাখাইন নারীরা পোল্ট্রি ও গৃহপালিত পশু পালনও করে থাকে।

রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। ধর্মীয় এবং ভাষাগত জ্ঞানের জন্য বৌদ্ধ মন্দিরে যায়। বৌদ্ধ পাঠশালা বা খ্যাং (khyang/ Monastery) এ রাখাইন শিশুদের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি রাখাইনরা যাদুবিদ্যা, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি এবং নানাবিধ কুসংস্কারে বিশ্বাসী। তারা ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব উদযাপন করে থাকে। গৌতম বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী ও প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন রাখাইন অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

রাখাইন সমাজের রীতি অনুযায়ী বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান বা দিবসের শুরুতে তারা পিতা-মাতা, বয়স্ক ব্যক্তি এবং বুদ্ধের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তারা বিভিন্ন নকশা করা পিঠা ও মিষ্টি জাউ-ভাত (Prorridge) পরিবেশন করে থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরে রাখাইনদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব রয়েছে। রাখাইনদের সবচেয়ে বড় উৎসবকে হচ্ছে জলকেলি উৎসব। এপ্রিল মাসে নববর্ষের প্রাক্কালে চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে তিন দিন ধরে এ উৎসব উদযাপন করা হয়। তারা বসন্ত উৎসবও পালন করে থাকে।

শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাখাইনদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। স্থাপত্যকলা, চারু ও কারুকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাটক, সংগীত, নৃত্যকলা ইত্যাদিতে রাখাইন জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ও সমুদ্র উপকূলের সমতল ভূমিতে রাখাইনরা বসবাস করে। নিচে খালি রেখে উঁচু ভিত বা মাচার উপর ঘর নির্মাণ করে তারা বসবাস করে। ঘর তৈরির উপকরণ হিসেবে তারা গোলপাতা, টিন প্রভৃতি ব্যবহার করে।

খাদ্য, পোশাক, পরিবার ও বিবাহ: রাখাইনরা সাধারণত ভাত, মাছ, ডাল এবং শাক সবজি খেয়ে থাকে। শূকর এবং শুটকি মাছ তাদের প্রিয় খাবার। রাখাইন পুরুষেরা সাধারণত লুঙ্গি ও ফতুয়া পরে থাকে। রাখাইনরা বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে মাথায় পাগড়ি পরে। রাখাইন নারীরা নকশাকৃত লুঙ্গি এবং ব্লাউজ পরিধান করে। রাখাইন নারীরা তাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের অলংকার এবং চুলে ফুল পরে থাকে।

বিবাহ রাখাইন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সাধারণত অভিভাবকেরাই বিবাহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। তবে বর্তমানে প্রেমের বিয়েও এ সমাজে দেখা যায়। যৌতুক প্রথা রাখাইন সমাজে নিষিদ্ধ। রাখাইন পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। পরিবারে নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই সমান অধিকার রয়েছে। পুত্র এবং কন্যা উভয়েরই পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাখাইন সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে মণিপুরি এবং রাখাইন উভয়েই সমতলের অধিবাসী। তারা বর্তমান ভারত এবং এবং মায়ানমার থেকে আগত হলেও এখন এদেশের নাগরিক। তাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্যময় করেছে। পেশা, বিবাহ এবং পরিবার কাঠামোয় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। মণিপুরিরা বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে। রাখাইনদের বসবাস প্রধানত পটুয়াখালী এবং কক্সবাজারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মণিপুরি ভাষার দু'টি উপবিভাগের নাম কী?

ক) বিষ্ণুপ্রিয়া ও মৈতৈ খ) বাংলা ও অহমিয়া

গ) উড়িয়া ও অহমিয়া ঘ) কোনোটি নয়

২। বাংলাদেশে মণিপুরিদের মূল বাসস্থান কোথায়?

ক) পটুয়াখালী খ) পার্বত্য চট্টগ্রার্ম

গ) সিলেটে ঘ) রাজশাহী

৩। 'রাখাইন' শব্দের অর্থ কী?

ক) ঐতিহ্যবাহী খ) রক্ষণশীল গ) ঈশ্বরের সন্তান ঘ) সাগরপুত্র

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। ডাকওয়ার্থ (Duckworth) কিসের ভিত্তিতে নরগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ করেছেন?
(ক) চুলের ভিত্তিতে (খ) মাথা, চোয়াল ও করোটিতত্ত্বের ভিত্তিতে
(গ) গায়ের রঙের ভিত্তিতে (ঘ) কোনোটিই নয়

২। জাতিগতভাবে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় কী?
(ক) কৃষ্ণকায় (খ) অস্ট্রেলীয়
(গ) দ্রাবিড়ীয় (ঘ) সংকর জাতি

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। চাকমা সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে–

(i) কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব

(ii) আধুনিক শিক্ষা

(iii) মুদ্রা ও বাজার অর্থনীতি

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

গ. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

এ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত। এদের সমাজের প্রধান হলেন বোমাং চিফ বা বোমাং রাজা। এদের ভাষায় এ গ্রামকে বলা হয় 'রোয়া'। গ্রামবাসী দ্বারা গ্রামের প্রধান মনোনীত হয়, যাকে 'রোয়াজা' বলা হয়।

৪। উদ্দীপকে কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে?
(ক) চাকমা (খ) মারমা
(গ) গারো (ঘ) ত্রিপুরা

৫। কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বান্দরবান জেলায় বেশি বসবাস করে?
(ক) মারমা (খ) চাকমা
(গ) গারো (ঘ) ত্রিপুরা

ঘ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

সংগীতা কলেজের বন্ধুদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে শিক্ষা সফরে গিয়েছিল। বাড়িতে ফিরে সে বাবা-মায়ের সাথে অনেক গল্প করলো। সে রাঙামাটিতে চাকমা, বান্দরবানে মারমা জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং সংস্কৃতি দেখেছে। কক্সবাজারেও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপস্থিতি তাকে অভিভূত করেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন দোকানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মেয়েরা পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছে।

১) বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? ১
২) পাহাড় এবং সমতলের তিনটি করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নাম লিখুন। ২
৩) উদ্দীপকের আলোকে মারমা জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং সংস্কৃতি বর্ণনা করুন। ৩
৪) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১	ঃ	১। ঘ	২। ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩	ঃ	১। গ	২। খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪	ঃ	১। খ	২। গ	৩। গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬	ঃ	১। খ	২। ঘ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৯	ঃ	১। ক	২। গ	৩। খ		
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। ঘ	৪। খ	৫। ক